দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প : গার্মেন্টস শিল্পে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অতি দারিদ্র্য হ্রাস প্রকল্প

"মঙ্গা থেকে মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে একটি উদ্যোগ"

অর্থায়নে

সিঁড়ি/ইইপি

অংশীদারিত্বে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ডিএফআইডি

বাস্তবায়নে

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)

গাইবান্ধা, বাংলাদেশ।

মুখবন্ধ

অতিদরিদ্র, দরিদ্র ও দুর্যোগ কবলিত অসহায় মানুষের জীবন জীবিকার মান উন্নয়নে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সঙ্গে পরিচালনা করে আসছে। আমরা বিশ্বাস করি, একটি কার্যকরী পরিকল্পনা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এরই ধারাবাহিকতায় দারিদ্র্য বিমোচনে সংস্থা বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি সম্পদ স্থানান্তর, কাজের বিনিময়ে অর্থ, ক্ষুদ্র পরিসরে আর্থিক সহায়তা ও বিভিন্ন ধরনের আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। একেবারে ক্ষুদ্র পরিসরে গাইবান্ধা জেলায় সংস্থাটি মঙ্গা থেকে দরিদ্র মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে একটি নতুন উদ্যোগ হিসেবে গার্মেন্টস শিল্পে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অতি দারিদ্র্য হ্রাস প্রকল্পটি গ্রহণ করে। প্রথমবারের মতো প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করতে গিয়ে আমরা উপলব্ধি করেছি যে দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে এই সেক্টরে অনেক সুযোগ রয়েছে এবং বিশেষ করে দরিদ্র নারীদের এক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। যদি এই সেক্টরে দক্ষ শ্রমিক গড়ে তুলে যথোপযোগী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় তবে তারা তাদের পরিবার, সমাজ তথা দেশের সার্বিক কল্যাণে একটি স্থায়ীত্বশীল ভূমিকা রাখতে পারে।

সংস্থা ইতোমধ্যে ১১৬০ জন দরিদ্র বেকার তরুণ-তরুণীদের দক্ষতা উন্নয়ন পূর্বক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে যারা উপার্জনের মাধ্যমে তাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের শেষ প্রান্তে অর্জিত লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে প্রাইভেট সেক্টরে গার্মেন্টস ছাড়াও অন্যান্য ট্রেডেও কাজ করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। এই লক্ষ্যে সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হলো সরকার, এনজিও ও প্রাইভেট সেক্টরের ফলপ্রসু সমন্বয় ও সহযোগিতা যা দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে গার্মেন্টস শিল্পসহ অন্যান্য কলকারখানা গড়ে তুললে দারিদ্র্য ও মঙ্গা কবলিত অসহায় মানুষের উন্নয়নে ব্যাপকভাবে কাজ করা যেতে পারে।

প্রকল্পের লব্ধ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, উৎকৃষ্ট উদাহরণ ও উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো সংকলিত করে প্রগতিশীল উদ্যোক্তাদের কাছে তুলে ধরাই এই প্রকাশনাটির মূল লক্ষ্য। আশা করছি, উন্নয়ন ধারার এই প্রকাশনাটি উন্নয়নকর্মী, অংশীদার, প্রাইভেট সেক্টর প্রতিনিধি, দাতা সংস্থা, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ পাঠকদের উন্নয়ন পরিক্রমার আবর্তে এক নতুন ধারণায় অনুপ্রাণিত করবে।

সর্বোপরি, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য সকল দাতা সংস্থা, সহভাগী ও অংশীদারদের প্রতি ধারাবাহিক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়াও প্রকল্পটির সকল বাস্তবায়নে যারা নিরলসভাবে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদেরকেও আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সম্পাদক
এম. আবদুস সালাম

সম্পাদনা পরিষদ
আনজুম নাহিদ চৌধুরী
আসাদুল ইসলাম আসাদ
আফতাব হোসেন
কিশোর কুমার সরকার
ধরিত্রীন্দু বর্মণ

নির্বাহী সম্পাদক
আলীম-আল-রাজী

স্থির চিত্র
কুদ্দুস আলম
অভিজিৎ রায় পার্থ
জাহাঙ্গীর আলম বাদল

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
বিপ্লব দাস অরু

প্রকাশনায়
গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)
নশরৎপুর, গাইবান্ধা ৫৭০০
পোস্ট বক্স-১৪, বাংলাদেশ।
ফোন ও ফ্যাক্স: +৮৮ ০৫৪১-৮৯০৪২
ইমেইল: guk.gaibandha@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.guk.org.bd

এই প্রকাশনাটির ক্ষেত্রে আপনাদের গঠনমূলক পরামর্শ বা মতামত guk.gaibandha@gmail.com, documentation.guk@gmail.com এই ঠিকানায় পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করছি।

সূচিপত্র

- ভূমিকা ০৩
- বাস্তবায়নকারী সংস্থা ০৪
- প্রকল্পের মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ০৪
- মূল কার্যক্রমসমূহ ০৫
- কর্মএলাকা ও প্রকল্পের মেয়াদ ০৬
- প্রকল্পের উপকারভোগী ও স্টেকহোল্ডার ০৬
- উপকারভোগীর বৈশিষ্ট্যসমূহ ০৭
- প্রত্যাশিত ফলাফল ও অগ্রগতি ০৭
- ব্যক্তি-পরিবার পর্যায়ে পরিবর্তনসমূহ ০৮
- অর্থায়নকারী সংস্থা ০৯
- SWOT বিশ্লেষণ ১০
- জেলা প্রশাসকের মন্তব্য ১১
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মন্তব্য ১১
- প্রকল্প সম্পর্কে জন প্রতিনিধিদের মন্তব্য ১২
- সোনালী স্বপ্নে বিভোর আইরিন ১৫
- আরো বড় হওয়ার স্বপ্ন আমিনুলের ১৬
- স্বচ্ছলতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে শিল্পি ১৭
- দারিদ্র্যের সীমানা পেরিয়ে আশিকুর ১৮
- অন্ধকার থেকে আলোর দুয়ারে মুক্তা ১৯
- আনন্দের ছোয়া এখন লোকমানের পরিবারে ২০
- আরো এগিয়ে যেতে চায় এসমোতারা ২১
- বেকার তসলিমের ভবঘুরে জীবনের অবসান ২২
- স্বপ্ন পূরণের প্রচেষ্টায় আরজিনা ২৩
- সুখময় জীবন কাটছে মোসলেমার ২৪

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)

উন্নয়ন প্রচেষ্টায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)'র পথ চলা শুরু হয় ১৯৮৫ সালে। গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার বোয়ালী ইউনিয়নের নিভৃত গ্রাম রাধাকৃষ্ণপুরের দরিদ্র ও পিছিয়ে থাকা নারী ও পুরুষদের সংগঠিত করার মাধ্যমে জিইউকে উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে।

সকল দরিদ্র নারী, পুরুষ ও শিশুর জন্য জীবন-মান উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/আদিবাসী ও প্রতিবন্ধীদের মূলস্রোত ধারায় সম্পৃক্তকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, পরিবেশ উন্নয়ন, স্থায়িত্বশীল ও দুর্যোগ সহায়ক কৃষি ব্যবস্থাপনা, কর্মমুখী শিক্ষা, যান্ত্রিক শিল্পের উপযোগী দক্ষতা সৃষ্টি, তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, সুশাসন ও গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র। উন্নয়ন পরিধিতে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, সরকার, স্থানীয় সরকার, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজসহ সকলের সাথে সুসম্পর্কের মাধ্যমে জিইউকে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। এলাকার চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে ২০০৭ সাল হতে জিইউকে গাইবান্ধা জেলার বাইরে রংপুর বিভাগের রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট এবং নীলফামারি জেলায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে। বর্তমানে ২৮টি উপজেলায় ১০২টি ইউনিয়নের প্রায় ১,৪০,০০০ (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার) পরিবারের সাথে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)

দারিদ্র্য-মুক্ত এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে নারী-পুরুষের ন্যায্যতা, সমতা ও মানবাধিকার নিশ্চিত হবে এবং সবাই যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার সাথে বসবাস করবে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

জিইউকে'র রূপকল্প (vision) অর্জনের জন্য সাতটি কৌশলগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- যা নিম্নরূপ:

১. মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং তৃণমূল জনগণের সংগঠন তৈরি;
২. সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা;
৩. দরিদ্র ও অতিদরিদ্র নারী-পুরুষের স্থায়িত্বশীল জীবিকায়ন;
৪. সবক্ষেত্রে নারী- পুরুষের বৈষম্য হ্রাস এবং নারীর ক্ষমতায়ন;
৫. জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিকর প্রভাব ও দুর্যোগ মোকাবেলায় স্থানীয় জনগণের সামর্থ্য বৃদ্ধি;
৬. দরিদ্র নারী-পুরুষ ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ এবং
৭. সু-শাসন ও গণতান্ত্রিক পরিবেশের বিকাশ।

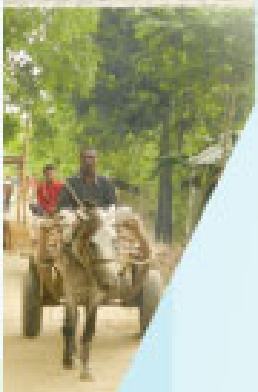

ভূমিকা

বাংলাদেশের উত্তরপ্রান্তের বৃহত্তম তিনটি নদ তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা বিধৌত গাইবান্ধা জেলাটি ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে সারাবছর বন্যা, নদীভাঙ্গন, মঙ্গা, শৈত্যপ্রবাহ, কালবৈশাখী ঝড়সহ নানা দুর্যোগের দুর্বিপাকে আক্রান্ত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই ধারাবাহিকতায় দারিদ্র্যের প্রকোপটি চরম আকার ধারণ করে যা জেলার ৪টি উপজেলার ২৩টি ইউনিয়নের অসংখ্য অসহায় দরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকার তাগিদে নিরলসভাবে দারিদ্র্য ও দুর্যোগের সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয়। জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ নদী বেষ্টিত চরাঞ্চল ও নদীর অববাহিকায় বসবাসরত এই দরিদ্র ও অসহায় মানুষেরা আরো চরমভাবে প্রকৃতির রুদ্ররোষে নিপতিত হয়।

এ জেলার অর্থনীতি সম্পূর্ণই কৃষিনির্ভর যা এ সকল ভাগ্যহীন মানুষের জন্য সারাবছর আয় বা কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে পারে না। অন্যদিকে সরকারি বা স্থানীয় উদ্যোগের অভাবে এলাকায় গড়ে উঠছে না কোন ধরনের শিল্প কলকারখানা, যেখানে তারা বাঁচার তাগিদে কোন কর্মের সন্ধান পাবে।

ফলে এসব ভূমিহীন ও নিঃস্ব মানুষেরা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে প্রতিনিয়ত নিরাশ্রয়, স্থানান্তরিত ও কর্মহীন হয়ে পড়ছে। উপরন্তু বছরের বিশেষ একটি সময় আকস্মিক খাদ্যাভাব বা মঙ্গা এলাকার মানুষদের আরো বিচলিত ও অসহায় করে তোলে। এই সংকটের এমন এক দুর্যোগময় মুহূর্তে বিশেষ করে নারী, শিশু ও বয়স্কদের জীবনে নেমে আসে অনাহারের ঘোর অমানিষা।

এরকম একটি বৈরী পরিস্থিতিতে এই মঙ্গা মোকাবেলায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) দরিদ্র ও দুর্যোগে আক্রান্ত এই সকল অসহায় মানুষদের জীবন-জীবিকার স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নে এই কারিগরি উদ্যোগটি গ্রহণ করে। যার মাধ্যমে অতি-দরিদ্র পরিবারের তরুণ-তরুণীদের গার্মেন্টস শিল্পভিত্তিক দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অতি দারিদ্র্য হ্রাস প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য

২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা ১-এর টার্গেট ১ ও ২ অর্জনে সহযোগিতা করা।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য

২০১৩ সালের মধ্যে পাইবান্ধা জেলার ১১৬০টি অতি-দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের (কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ নারী) দারিদ্র্য বিমোচন।

উদ্দেশ্য

- অতিদরিদ্র পরিবারের আগ্রহী নারী ও পুরুষদের (কমপক্ষে ৫০% নারী) গুভেন গার্মেন্টস-এর মেশিন অপারেটর হিসেবে দক্ষ করে তোলা;
- লক্ষ্যভুক্ত উপকারভোগীদের প্রতিষ্ঠিত গুভেন গার্মেন্টস-এর মেশিন অপারেটর হিসেবে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা; এবং
- লক্ষ্যভুক্ত উপকারভোগী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের মাঝে মৌলিক অধিকার ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্ম এলাকার স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিবর্গ, সাংবাদিক, সুশীল সমাজ এবং কমিউনিটিকে প্রকল্প সম্পর্কে অবগত করে তাদেরকে প্রকল্পে সম্পৃক্ত করা হয়। প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে বিজিএমইএ, প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন গার্মেন্টস এবং এ্যাপেক্স-এর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করে প্রাইভেট সেক্টরকে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। এছাড়াও প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- অতিদরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে থেকে নিবিড়ভাবে জরিপ এবং পারিবারিক প্রোফাইল তৈরি করে প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন এবং তাদের প্রোফাইল তৈরি;
- ওভেন গার্মেন্টস-এর মেশিন পরিচালনা বিষয়ে মাসব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টস-এ দুইমাসব্যাপী ইন্টার্নশীপ এবং উপকারভোগীদের আবাসন-এর ব্যবস্থা করা;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টস-এ উপকারভোগীদের চাকুরীর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা;
- উপকারভোগীদের পরিবারের জন্য পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা (FDP) তৈরিতে সহায়তা করা;
- উপকারভোগীদের পরিবারে ক্ষুদ্র আকারের আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;
- উপকারভোগী ও তাদের পরিবারে জন্য নিয়মিত ফলো-আপ সহায়তা অব্যাহত রাখা;
- সিড়ি-এর কারিগরি সহায়তায় উপকারভোগীদের পরিবর্তনসমূহ পর্যবেক্ষণের জন্য মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিয়মিত মনিটরিং (CMS-2)
- স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমের সাথে প্রচারণামূলক কার্যক্রম।

কর্মএলাকা

গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন। বোয়ালী, মালিবাড়ী, ঘাগোয়া, কামারজানী, পিদারী, বাদিয়াখালী, খোলাহাটি, বল্লমঝাড়, রামচন্দ্রপুর এবং মোল্লারচর ইউনিয়ন। এছাড়াও প্রকল্পের কিছু কার্যক্রম যেমন; প্রশিক্ষণার্থীদের ইন্টার্নশীপ, চাকুরী প্রাপ্তি, গণমাধ্যমে প্রচারণা, প্রাইভেট সেক্টরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও কর্মরত প্রশিক্ষণার্থীদের ফলো-আপ করার জন্য ঢাকা, গাজীপুর এবং নারায়ণগঞ্জ জেলাতেও প্রকল্পের কর্মএলাকা বিস্তৃত।

প্রকল্প মেয়াদ

ডিসেম্বর ২০১০ হতে নভেম্বর ২০১৩ সাল পর্যন্ত ।

প্রকল্পের উপকারভোগী ও স্টেকহোল্ডার

প্রকল্পের সাথে মোট ১১৬০ জন উপকারভোগী সরাসরি যুক্ত রয়েছেন, যার মধ্যে কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ নারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যসহ মোট আনুমানিক ৬ হাজার জন এই প্রকল্প সুবিধা পাচ্ছেন। এছাড়াও দেশে তৈরি পোষাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), Apex Adelchi Footwear Limited, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং গণমাধ্যম এই প্রকল্পের সাথে ওতোপ্রতোভাবে যুক্ত রয়েছে।

উপকারভোগীর বৈশিষ্টসমূহ

নিম্নলিখিত বৈশিষ্টসমূহের ভিত্তিতে প্রকল্পে যে পরিবারগুলোকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে–

১. চাষযোগ্য জমি নেই;
২. বছরে ৪ মাস দিনে দুই বেলার বেশি খাবারের সামর্থ্য নেই;
৩. ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত নয় এমন পরিবার;
৪. নদীভাঙন অথবা ভাঙনপ্রবণ এলাকায় ঘর অথবা দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বসবাস করে;
৫. পরিবারের মাসিক সর্বোচ্চ আয় ২ হাজার টাকার বেশি না;
৬. উৎপাদনযোগ্য সম্পদ: যার মূল্যমান সর্বোচ্চ ৮ হাজার টাকার বেশি নয়;

এছাড়াও নারীপ্রধান পরিবার যেখানে উপার্জনক্ষম পুরুষ নাই; বাড়ির অবস্থা ভালো নয়, জায়গা কম; পরিবারে প্রতিবন্ধী সদস্য আছে; শিশুশ্রমের মাধ্যমে পরিবার পরিচালিত হয়; অন্যের জায়গায় বসবাস করে; সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পায়, তবে অনুদানের পরিমাণ খুব কম ও সরকারি সহযোগিতা পাওয়ার যোগ্য কিন্তু পাচ্ছেন না, এসকল পরিবারদের অগ্রাধিকার পেয়েছে।

প্রত্যাশিত ফলাফলসমূহ

ফলাফল ১	অতিদরিদ্র পরিবারের ১১৬০ জন ব্যক্তি (কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ নারী) ওভেন গার্মেন্টস-এর দক্ষ মেশিন অপারেটর হিসেবে গড়ে উঠবে;
ফলাফল ২	অতিদরিদ্র পরিবারের ১১৬০ জন ব্যক্তির (কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ নারী) ওভেন গার্মেন্টস-এর মেশিন অপারেটর হিসেবে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি হবে;
ফলাফল ৩	সরকারি বিভিন্ন সহযোগিতা এবং ছোট মাত্রার আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের মাধ্যমে প্রকল্পের ১১৬০টি উপকারভোগী পরিবারের সদস্যদের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণগত ও গুণগত মান বৃদ্ধি হবে।

এক নজরে প্রকল্পের অগ্রগতি

(ডিসেম্বর ২০১০ হতে আগষ্ট ২০১৩ পর্যন্ত)

প্রকল্পের শুরুতে কর্মএলাকার ১০টি ইউনিয়নে উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য পিআরএ সম্পন্ন করা হয়েছে। বিজিএমইএ-এর সাথে প্রকল্প অবহিতকরণ সভা, প্রকল্প এলাকায় ১০টি ইউনিয়নে প্রকল্প অবহিতকরণ সভা করা হয়েছে। এছাড়া এপেক্স এডেলকি ফুটওয়ার লিঃ এবং ৪টি গার্মেন্টস-এর সাথে গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্প বিষয়ে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সাথে প্রেস ব্রিফিং করা হয়েছে। এছাড়া নিম্নলিখিত অগ্রগতিগুলো অর্জিত হয়েছে:

- ১১৬০ জন উপকারভোগী নির্বাচন (তরুণ-৬৪৬, তরুণী-৫১৪) করা হয়েছে।
- উপকার ভোগীদের পরিবারের সদস্যদের সাথে ৩৪৪টি অভিভাবক সভা করা হয়েছে।
- ১১৬০ জন (তরুণ-৬৪৬, তরুণী-৫১৪)-কে নিয়ে মাসব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
- ১১৬০ জন উপকারভোগীর জন্য ১৪টি বিষয়ে সচেতনতামূলক সেশন সম্পন্ন করা হয়েছে।

- ১১৫৫ জন (তরুণ-৬৪৬ জন, তরুণী-৫০৯ জন) প্রশিক্ষণার্থী দুই মাসের ইন্টার্ণশীপ কার্যক্রমে যোগদান করেছে।
- ১১০৪ জন (তরুণ-৬২৩ জন, তরুণী-৪৮১ জন) প্রশিক্ষণার্থী ইন্টার্ণশীপ কার্যক্রমে সফলভাবে সমাপ্ত করে নিয়মিত চাকুরী করছে।
- ১১৬০ জন উপকারভোগীর CMS-1 (Household Baseline Profile) সম্পন্ন হয়েছে।
- ১০টি নির্বাচিত দলে তাদের পরিবর্তনসমূহ পর্যবেক্ষণের জন্য CMS-4 (Quarterly Group Reflections) চলমান রয়েছে।
- ৫ জন নির্বাচিত উপকারভোগীর পরিবর্তনসমূহ পর্যবেক্ষণের CMS-5 (Household Tracking Study) চলমান রয়েছে।
- ১১৬০টি পরিবারের পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা (Family Development Plan-FDP) তৈরিতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ১১৬০টি পরিবারে আয়বৃদ্ধিমূলক সম্পদ (ছাগল/ভেড়া, হাঁস-মুরগী ও গাছের চারা) হস্তান্তর করা হয়েছে।
- ৫টি স্থানীয় এবং ৭টি জাতীয় পত্রিকায় ২১টি সংবাদ প্রকাশিত এবং ৯টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে মোট ১৩টি সচিত্র প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে।
- সরকারি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি, দাতা সংস্থা, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধিগণ প্রকল্প চলাকালে একাধিকবার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং কর্মএলাকা পরিদর্শন করে উৎসাহ প্রদান ও প্রশংসা করেছেন।

ব্যক্তি-পরিবার পর্যায়ে পরিবর্তনসমূহ

সিড়ি/ইইপি-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত সকল উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য রয়েছে মানসম্পন্ন মনিটরিং পদ্ধতি যা Change Monitoring System (CMS) নামে পরিচিত। এই পদ্ধতির মাধ্যমে উপকারভোগী ও তাদের পরিবারগুলোর প্রাথমিক অবস্থা হতে বর্তমান পর্যন্ত তাদের পরিবর্তনসমূহ পর্যায়ক্রমে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনলাইনে প্রতিমাসে পরিবারগুলোর সার্বিক তথ্য সংগ্রহ ও অগ্রগতি বিশ্লেষণ করা হয়। এছাড়াও এই প্রকল্পে 'পারিবারিক আয়-ব্যয় ব্যবস্থাপনা' কার্ডের মাধ্যমে উপকারভোগী ও তাদের পরিবারের নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে।

- ১০৭৬ জন উপকারভোগী এ পর্যন্ত তাদের আয় থেকে সর্বমোট ১,১৮,৬৬,৬২৫/= টাকা পরিবারে পাঠিয়েছে।
- ৭৭৪টি পরিবার এ পর্যন্ত সর্বমোট ২৩,৯৬,২৮৭/= টাকা সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছে এবং যা চলমান রয়েছে।
- ৪২৬টি পরিবারের ৪২৬ জন শিশু স্কুলে ভর্তি হয়েছে এবং তারা নিয়মিতভাবে পড়াশুনা করছে।
- ৫৮৭ জন উপকারভোগী মোবাইল ফোন ক্রয় করেছে এবং তা প্রয়োজনীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- ২৭৯ জন উপকারভোগী বিভিন্ন ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানে ডিপিএস-এর মাধ্যমে সঞ্চয় করছে।

- ১৩৭ জন উপকারভোগী তাদের আয় থেকে পরিবারে ১৩৭টি গাভী ক্রয়ে অর্থ সহায়তা দিয়েছে।
- ৯৪ জন উপকারভোগী তাদের আয় থেকে পরিবারে ৯৪টি ছাগল ক্রয়ে অর্থ সহায়তা দিয়েছে।
- ৪২টি পরিবার তাদের সন্তানদের পাঠানো টাকায় ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করেছে।
- ২০টি পরিবার রিক্সা/সাইকেল ক্রয় করেছে।
- ৩৮টি পরিবার তাদের সন্তানদের পাঠানো টাকায় টেলিভিশন ক্রয় করে বিনোদন, তথ্য ও জ্ঞান অর্জন করছে।
- ১৪৭টি পরিবার জমি বন্ধক নিয়ে নিজেরা চাষাবাদ করছে।
- ২৪টি পরিবার চাষাবাদের জন্য আবাদি জমি ক্রয় করেছে।
- ৩৮৭টি পরিবার জমি আদি নিয়ে চাষাবাদ করছে।
- ৭৬টি পরিবার নতুন ঘর তৈরি করেছে এবং ২৯৪টি পরিবার তাদের পুরাতন ঘর সংস্কার করেছে।
- ১৬৮টি পরিবার তাদের ঘরের জন্য নতুন টিন ক্রয় করেছে।
- ১৪৮টি পরিবার তাদের বাড়িতে নতুন ল্যাট্রিন স্থাপন করেছে।
- ১০৩টি পরিবার তাদের বাড়িতে নলকূপ স্থাপন করেছে।
- ৫৪ জন নারী উপকারভোগী তাদের নিজের জন্য স্বর্ণের গয়না তৈরি করেছে।
- ১৯২টি পরিবার তাদের বাড়িতে নতুন আসবাবপত্র ক্রয় করেছে (শোকেস, খাট, আলনা ইত্যাদি)।
- ২২২টি পরিবার নিজেদের ব্যবহারের জন্য ১৩২২ মণ ধান ক্রয় করেছে।
- ২১৫টি পরিবার ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে 'সরকারি নিরাপত্তা বলয়ের' সেবার আওতায় এসেছে।
- ৩ জন উপকারভোগী তাদের আয় থেকে তাদের পরিবারে ৩টি সেলাই মেশিন ক্রয় করে দিয়েছে।
- ৪ জন উপকারভোগী তাদের আয় থেকে তাদের পরিবারে ৪টি ফ্যান ক্রয় করে দিয়েছে।
- ১০ জন উপকারভোগী তাদের পরিচিত ১৫ জনকে বিভিন্ন গার্মেন্টস/এ্যাপেক্স-এ চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

অর্থায়নকারী সংস্থা

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে Stimulating Household Improvements Resulting Empowerment (shiree). This is a part of the initiatives of the Economic Empowerment of the Poorest (EEP) Challenge fund with the partnership between UKaid of DFID and GoB.

প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় ও আলোচনা সাপেক্ষে এই প্রকল্পের বেশ কিছু সবল দিক যেমন উন্মোচিত হয়েছে তেমনি কিছু সীমাবদ্ধতাও লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন কিছু বাধা বা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কিছু শিক্ষণীয় বিষয় ও সম্ভাবনার ক্ষেত্র ভবিষ্যতে এরূপ সৃজনশীল প্রকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে।

প্রকল্পের সবল দিকসমূহ

- উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় জিইউকে'র সুনাম ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা;
- স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও আস্থা;
- অতি-দরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ;
- প্রশিক্ষণের জন্য নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও আবাসিক ব্যবস্থা;
- দক্ষ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষক ও কর্মীবাহিনী।

সীমাবদ্ধতাসমূহ

- গার্মেন্টস সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ মডিউল ও উপকরণ-এর স্বল্পতা;
- দক্ষতা উন্নয়নে শুধুমাত্র অতিদরিদ্র পরিবার থেকে উপকারভোগী নির্বাচন;
- গার্মেন্টস সেক্টরে প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ ও প্রশিক্ষক উন্নয়নের জন্য ইন্সটিটিউট বা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা;
- গার্মেন্টস শিল্পে দক্ষতা উন্নয়নে প্লেইন মেশিন ছাড়া অন্য কোন মেশিন ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা।

বাধা বা চ্যালেঞ্জসমূহ

- ইন্টার্নশীপ-এর জন্য যথাযথ গার্মেন্টস বাছাইকরণ;
- গ্রামের তরুণ-তরুণীদের শহুরে পরিবেশ ও প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সময়সূচির সাথে খাপ খাওয়ানো;
- ইন্টার্নশীপে অংশগ্রহণকারীদের জন্য ঢাকায় মানসম্মত আবাসনের ব্যবস্থা;
- কর্মে যোগদানের পর এলাকা পরিবর্তনের জন্য স্বাস্থ্যগত (জন্ডিস, চর্মরোগ, পেটের অসুখ ইত্যাদি) সমস্যা;
- অনেক ক্ষেত্রে তরুণী অংশগ্রহণকারীর চাকুরীতে যোগদানের কিছুদিনের মধ্যেই পরিবার থেকে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার প্রবণতা;

আমরা যা শিখলাম

- প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন, সরকার, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমকে সম্পৃক্ত করলে সহজে সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জিত হয়;
- ইন্টার্নশীপ-এর মেয়াদকাল কমিয়ে আবাসিক প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করা গেলে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা অর্জনে অধিক সহায়ক হবে;
- প্রশিক্ষণকালীন সময়ে প্লেন মেশিন ব্যবহারের পাশাপাশি গার্মেন্টসে ব্যবহৃত অন্যান্য মেশিনের উপর প্রশিক্ষণ করানো গেলে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা ও চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।

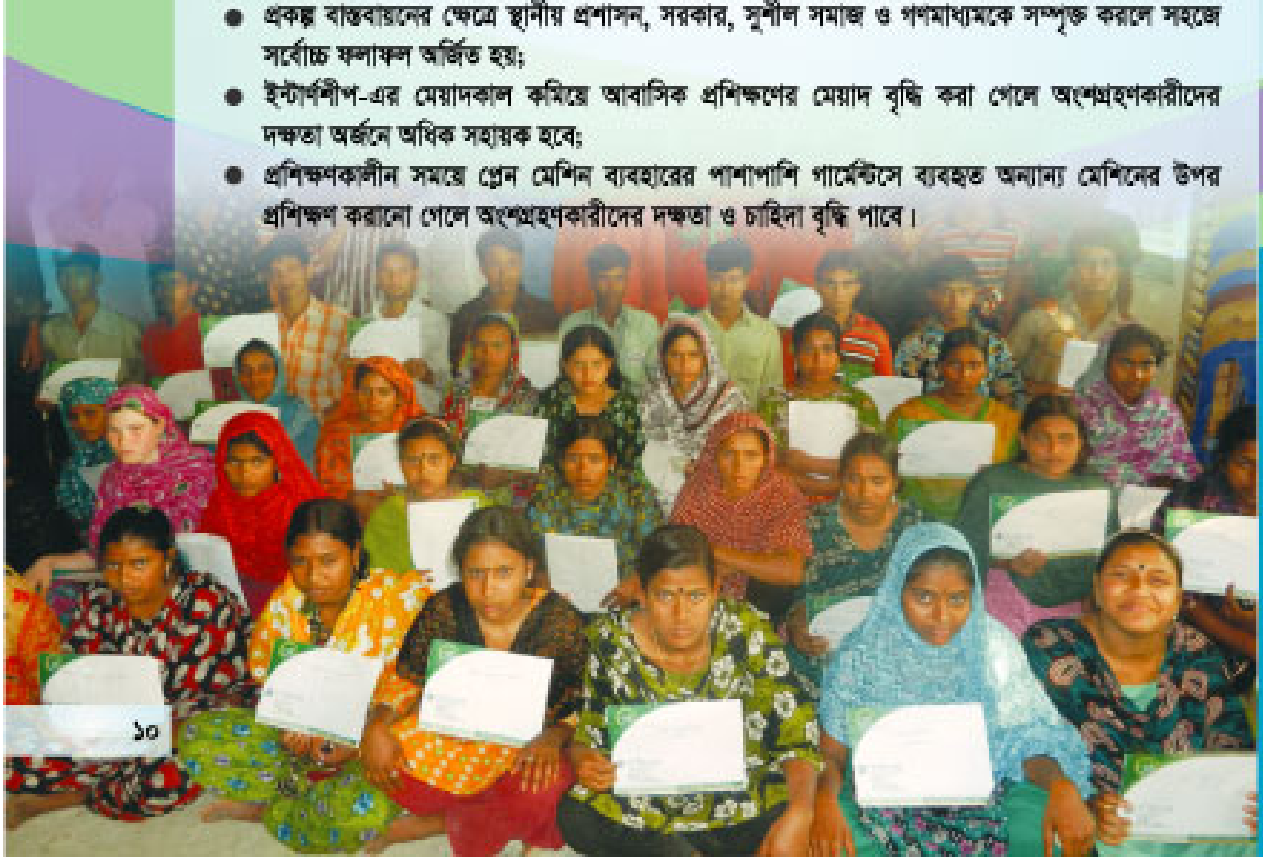

জেলা প্রশাসকের মন্তব্য

দুর্যোগ কবলিত, অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের জীবনমানের সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজন পরিবারভিত্তিক দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল। আর এই দক্ষ জনবল তৈরিতে সহযোগিতা করছে গাইবান্ধার অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)। বেকার যুবক-যুবতীদের গার্মেন্টস শিল্পের উপর জিইউকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় চাকুরী প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করার যে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে– তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। এই প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এমডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি বেকারত্ব দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

আমি বিশ্বাস করি, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মানুষ কোনদিন দরিদ্র থাকতে পারে না-যার দৃষ্টান্ত প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীরা। গাইবান্ধা থেকে এসব যুবক-যুবতী বিশেষ করে মেয়েরা দেশের বিভিন্ন গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে নিজ নিজ পরিবারে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি আর্থিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত হচ্ছে। এজন্য আমি বাস্তবায়নকারী এবং অর্থায়নকারী সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ড. কাজী আনোয়ারুল হক
জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা।

উপজেলা চেয়ারম্যানের মন্তব্য

গাইবান্ধার জেলার সদর উপজেলার মোট জনসংখ্যার অন্ততপক্ষে শতকরা ২০ ভাগ মানুষ নদীর তীরবর্তী ও চরাঞ্চলে বসবাস করে। এছাড়াও এই অঞ্চলে লোকজনের কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা না থাকায় দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে, গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের তরুণ-তরুণীদের গার্মেন্টস শিল্পে প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকুরীর নিশ্চিয়তা প্রদানের যে মহতি কর্মসূচি নিয়েছে তা সত্যিই একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। আমি জিইউকের এই উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এবং এই প্রকল্পটি চলমান থাকুক এই কামনা করি।

আলহাজ্ব আব্দুর রশীদ সরকার
চেয়ারম্যান
সদর উপজেলা পরিষদ, গাইবান্ধা।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মন্তব্য

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র কর্তৃক বাস্তবায়িত দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার তরুণ ও তরুণীদের গার্মেন্টস শিল্পে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং গার্মেন্টসে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। সেই সাথে তাদের জন্য কর্মস্থলের নিকটবর্তী এলাকায় আবাসিক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান যা সত্যিই প্রসংশার দাবীদার।

আমি সংস্থার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

মোঃ মামুনুর রশীদ
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।

প্রকল্প সম্পর্কে জন প্রতিনিধিদের মন্তব্য

'দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই ইউনিয়নে অনেক বেকার তরুণ-তরুণী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বর্তমানে দেশের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন গার্মেন্টস এ চাকুরী করছে। বেকার সমস্যা সমাধানে প্রকল্পটির গুরুত্ব অপরিসীম।'

টিআইএম নাজমুল হুদা বাদল
চেয়ারম্যান
২নং মালিবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।

'দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গার্মেন্টস-এ চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। উক্ত প্রকল্পটি চলমান থাকলে আমার ইউনিয়নের দরিদ্র নারী-পুরুষদের আরো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।'

মোঃ ইমারুল ইসলাম সাবিন
চেয়ারম্যান
৫নং বল্লমঝাড় ইউনিয়ন পরিষদ
গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।

'এই প্রকল্পের কার্যক্রম অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার এবং জিইউকের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।'

মোঃ রফিকুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
৬নং রামচন্দ্রপুর ইউনিয়ন পরিষদ
গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।

'প্রকল্পটি আরো গতিশীলভাবে চলমান রাখার আহবান করছি, বিশেষ করে নারীরা যে আয়মূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে এজন্য আমার ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে ধন্যবাদ জানাই।'

মোঃ রফিকুল ইসলাম মুজকুরি ফিরোজ
চেয়ারম্যান
৭নং বাদিয়াখালি ইউনিয়ন পরিষদ
গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।

'প্রকল্পটি প্রশংসার দাবি রাখে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে আরোও বেশি সংখ্যক বেকার নারী-পুরুষের গার্মেন্টসে চাকুরীর ব্যবস্থা হলে বোয়ালী ইউনিয়নের বেকার সমস্যার সমাধান হবে বলে আমার বিশ্বাস।'

মোঃ শহিদুল ইসলাম (সাবু)
চেয়ারম্যান
৮নং বোয়ালী ইউনিয়ন পরিষদ
গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।

প্রকল্প সম্পর্কে জন প্রতিনিধিদের মন্তব্য

'দক্ষতা উন্নয়নের এমন কার্যক্রম আরো ব্যাপককারে সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।'

মোঃ কাজী ইব্রাহিম খলিল উলফাত
চেয়ারম্যান
৯নং খোলাহাটী ইউনিয়ন পরিষদ
গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।

'এই ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দরিদ্র নারী ও পুরুষ বর্তমানে গার্মেন্টস-এ চাকুরী করছেন এবং তারা তাদের পরিবারে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।'

মোঃ আমিনুজ্জামান রিন্টু
চেয়ারম্যান
১০নং ঘাগোয়া ইউনিয়ন পরিষদ
গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।

'দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার তরুণ-তরুণীদের গার্মেন্টস শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে নিজেদের এবং পরিবারের সদস্যদের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।'

গোলাম ছালেক লেবু
চেয়ারম্যান
১১নং পিপারী ইউনিয়ন পরিষদ
গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।

'কামারজানী ইউনিয়নে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এই প্রকল্পের কার্যক্রম সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। আমি প্রকল্পের সফলতা কামনার পাশপাশি এর বিস্তৃতি কামনা করছি।'

মোঃ নুরুন্নবী সরকার ছকমদ
চেয়ারম্যান
১২নং কামারজানী ইউনিয়ন পরিষদ
গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।

সোনালী স্বপ্নে বিভোর আইরিন

পাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার বাদিয়াখালী ইউনিয়নের তালুকরিফাইতপুর গ্রামের আনারুল ইসলামের বড় সন্তান আইরিন। বাবা-মা সহ চার বোন এক ভাই মিলে সাতজনের সংসার আইরিনদের। বাবা আনারুল জাল বুনে তা বাজারে বিক্রি করে কোন রকমে অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে সংসার চালান। তবে পড়াশুনার প্রতি আইরিনদের পরিবারের আগ্রহ বেশি থাকার কারণে তিন মেয়েকেই স্কুলে ভর্তি করান আনারুল ইসলাম যার জন্য তাকে অতিরিক্ত সময়েও পরিশ্রম করতে হয়েছে। আইরিন যখন ১৮ বছর বয়সে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে তখন গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ে তালুকরিফাইপুর গ্রামে একটি মিটিং-এর আয়োজন করা হয়। মিটিং-এ ওই গ্রামের বিভিন্ন স্থান থেকে সকল পেশার সকল বয়সের নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন সদ্য এসএসসি পরীক্ষা দেওয়া আইরিন। লেখাপড়া জানা থাকার কারণে প্রকল্প সম্পর্কে বুঝতে বেশি সময় লাগেনি আইরিনের। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা শুরু হয় সেখান থেকেই। মিটিং থেকে ফিরেই পরিবারকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে এই চাকুরী করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পাশাপাশি নিজের খরচে পড়াশুনাও চালানো সম্ভব অন্যথায় বাবার সীমিত আয়ে তার পড়াশুনা আর হবে না এমনকি বোনদেরও পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। নিজের অত্যধিক উৎসাহ, দৃঢ় মনোবল এবং পরিবারের সম্মতি আইরিনের প্রকল্পভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে।

প্রকল্পের নির্বাচন নীতিমালা আইরিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ায় যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইরিনকে প্রকল্পভুক্ত করা হয়। ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে শুরু হয় আইরিনের কর্মজীবনের প্রথম পর্ব। গার্মেন্টস শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর ২২ দিন সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষে গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে গাজীপুরে এ্যাপেক্স এডেলকী ফুটওয়্যার লিমিটেডে ইন্টার্নশীপ-এ যোগ দেয় আইরিন এবং সফলভাবে ইন্টার্নশীপ শেষে নিয়মিত কর্মী হিসেবে সেখানেই যোগদান করে।

পাশাপাশি-এর মাঝেই তার এসএসসি পরীক্ষার ফল বের হয় এবং সে উত্তীর্ণ হয়। এ্যাপেক্স এডেলকি ফুটওয়ার লিমিটেডে চাকুরী করা অবস্থায় আইরিন বিভিন্ন জনের কাছে জানতে পারে যে, গার্মেন্টস সেক্টরে লেখাপড়া জানাদের সহজেই উপরে ওঠার সুযোগ আছে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার একান্ত ইচ্ছার কারণেই সে পার্শ্ববর্তী এ্যাপেক্স ল্যাঙ্গারী গার্মেন্টস-এ যোগদান করে। এ্যাপেক্স ল্যাঙ্গারী গার্মেন্টসে মাস খানেক কাজ করার পরেই তার এক নিকট আত্মীয়ের মাধ্যমে নিউজ গার্মেন্টস, নিশ্চিন্তপুর, সাভারে কোয়ালিটি অডিটর পদে লোক নেয়ার কথা জানতে পেরে সরাসরি সেখানে যোগাযোগ করে আইরিন। আইরিনের কথাবার্তা এবং হাতে কলমে কাজ দেখে গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষ তাকে কোয়ালিটি অডিটর পদে নিয়োগ দেয়। এখন সে বেতন ও অন্যান্য ভাতাসহ প্রতিমাসে ১০ হাজার টাকা করে আয় করছে। প্রতিমাসে ৪-৫ হাজার টাকা বাড়িতে পাঠাচ্ছে। নিজে পাইবান্ধা সরকারি কলেজে মানবিক বিভাগে এইচএসসি শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। নিজের নামে একটি বীমা করেছে যেখানে প্রতিমাসে ৩শ ৫০টাকা করে জমা দিচ্ছে। ছোট দুই বোন স্কুলে যায় যাদের সমুদয় খরচ আইরিন বহন করে। আইরিনের বাবা বর্তমানে ২ বিঘা জমি আদি নিয়ে চাষাবাদ করছে যার খরচ মেয়ে যোগান দিচ্ছে। আইরিন ১০ হাজার টাকা দিয়ে তার মাকে একটি গরু ক্রয় করে দিয়েছে। এছাড়াও বাড়িতে কিছু প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কিনে দিয়েছে। প্রকল্পের থেকে দেয়া ১টি ছাগল থেকে বর্তমানে ৪টি বাচ্চা হয়েছে। বর্তমানে তারা ৩ বেলা ভালভাবে খেতে পারছে। সামাজিকভাবে তাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে পোষাক পরিচ্ছদেও। আইরিনের স্বপ্ন চাকুরীর পাশাপাশি পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া যাতে করে সে আরো অনেক বড় পদে চাকুরী পেতে পারে।

"আইরিনের পাঠানো টাকা থেকে কিছু কিছু করে টাকা সঞ্চয় করে ব্যবসায় খাটানোর ফলে আমার ব্যবসা আগের চেয়ে অনেক বেশি ভাল চলছে।"

- আইরিনের বাবা আনারুল ইসলাম

আরো বড় হওয়ার স্বপ্ন আমিনুলের

মোঃ আমিনুল হক, বাবা-মা ও এক বোন নিয়ে তাদের মোট চার জনের ছোট একটি পরিবার নিয়ে গাইবান্ধা সদর উপজেলার মালিবাড়ী ইউনিয়নের কচুয়ারখামার গ্রামে তাদের বসবাস। বাবা আব্দুল জব্বার একজন দিনমজুর। দারিদ্র্যতার মধ্যে দিয়ে চলত তাদের সংসার। অতি কষ্টে কোনদিন দু'বেলা আবার কোনদিন একবেলা খেয়ে থাকতে হতো। অভাব অনটনের কারণে তৃতীয় শ্রেণিতে উঠার পর তার আর পড়াশুনা করাও হয়নি। নিজেদের কোন ভিটামাটি নেই তাই সরকারি খাস জমিতে অস্থায়ীভাবে একচালা ঘর তুলে কোন রকমে থাকে। বর্ষাকালের রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমানোরও উপায় ছিল না। চালের ফুটো দিয়ে বৃষ্টির পানি পরে ভিজে যেত তাদের বিছানা। আমিনুলের বাবার একার পক্ষে সংসার চালানো দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। আমিনুল ধান কাটার কাজে তার বাবার সাথে মাঝে মাঝে যুক্ত হলেও সে নিয়মিতভাবে কোন আয় করতো না। তবে এখানে সেখানে বিভিন্ন জনের কাছে কাজ খুঁজতো আমিনুল।

এমনি একটি সময়ে কিছু এলাকাবাসীর মুখে গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের কথা শুনতে পায় আমিনুল। নিজে থেকেই সে যোগাযোগ করে উক্ত প্রকল্পের কর্মীর সাথে। প্রকল্পের নির্বাচন নীতিমালা মিলে যাওয়ায় সহজেই সে প্রকল্পভুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। ২২ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ শেষে এ্যাপেক্স এডেলকি ফুটওয়্যার লিমিটেডে দুই মাসের ইন্টার্ণশীপ-এ যোগদান করে। প্রশিক্ষণ এবং ইন্টার্ণশীপে কঠোর পরিশ্রম করে নিজেকে দক্ষ মেশিন অপারেটর হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয় সে। যার ফল পেতেও তাকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। কিছুদিন এ্যাপেক্স এডেলকি ফুটওয়্যার লিমিটেডে চাকুরী করে আরো দক্ষতা অর্জন করে এলাকার একজনের পরামর্শে ঢাকার মালিবাগে দিগন্ত সোয়েটার লিমিটেড-এর অপারেটর হিসেবে যোগদান করে।

আমিনুল নিজেকে আরো যোগ্য করে তুলতে সেখানেও সে অনেক পরিশ্রম করতে থাকে। অক্লান্ত পরিশ্রম ও কাজের প্রতি আন্তরিকতার কারণে মাত্র দেড় বছরের মধ্যেই সে সুপারভাইজার পদে উন্নীত হয়। পদোন্নতি হওয়ায় সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। দরিদ্র পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার আত্মবিশ্বাস আরো বেড়ে যায়।

প্রথম বছরে নিজের খরচ চালিয়ে মাঝে মাঝে ২-৩ হাজার করে টাকা সে বাড়িতে পাঠাতো। বর্তমানে আমিনুল তার বেতন ও ওভারটাইম ভাতাসহ প্রতিমাসে ৯-১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করছে যা থেকে কিছুটা সঞ্চয়ের পাশাপাশি প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা করে বাড়িতে পাঠাচ্ছে। ছেলের পাঠানো টাকা দিয়ে তার বাবা আব্দুল জব্বার কিছু জমি আদি করছে। আদি জমির আয় এবং আমিনুলের সঞ্চিত টাকা দিয়ে দুইটি ঘর তৈরি করেছে। একমাত্র ছোট বোনের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সে গরু মোটাতাজা করণের জন্য তার বাবাকে ৭ হাজার টাকা দিয়ে একটি গরু কিনে দিয়েছে। এছাড়াও পরিবারের জন্য ১টি স্টীলের বড় বাক্স ও ১টি চাল রাখার জন্য ড্রাম কিনে দিয়েছে। এখন তাদের পরিবার সকল সদস্য তিনবেলা পেট ভরে খেতে পারছে। তার এই পরিবর্তনে আমিনুল হকের গ্রামের অনেকেই এখন তার খুব প্রসংশা করে। এলাকাবাসীরা স্থানীয় বেকার তরুণদের আমিনুলের পথ অনুসরণ করার জন্যে উৎসাহিত করেন।

'আমি আরও বড় হতে চাই, একমাত্র ছোট বোনটাকে শিক্ষিত করে তুলতে চাই এবং বাবাকে আর দিন মজুরিতে যেতে দেব না, খুব তাড়াতাড়ি তাকে দিয়ে ছোট খাটো একটি ব্যবসা শুরু করার ইচ্ছে আছে।'

- আমিনুল

স্বচ্ছলতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে শিল্পি

গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার বোয়ালী ইউনিয়নের রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামে শিল্পি'র বাড়ি। গ্রামটিতে অধিকাংশ নদীভাঙ্গা দরিদ্র মানুষের বসবাস। বাবা মধু মিয়া মা মঞ্জুরানী বোন দিলি খাতুন ছোট দুই ভাই মুকুল ও মুরাদসহ মোট ছয় সদস্য নিয়ে তাদের সংসার। শিল্পির বাবা একটি ভাড়া করা রিক্সা চালায়। সংসারের প্রয়োজনে শিল্পির মা মাঝে মাঝে পরের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে কিছু আয় করে। মধু মিয়া সংসারের আয় বৃদ্ধির জন্য জমি আদি করার চিন্তা করলেও তাকে কেউ জমি আদি দিত না কারণ ফসল চাষের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তাও সে জোগাড় করতে পারতো না। একদিন রিক্সা নিয়ে শহরে যেতে না পারলে বাড়িতে চুলা জ্বলত না শিল্পিদের। এভাবে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে থাকে শিল্পির পরিবার। অর্থের অভাবে ৫ম শ্রেণির পর আর স্কুলে যাওয়া হয়নি শিল্পির। বাবা পরিশ্রম দেখে শিল্পি মাঝে মাঝে ভাবত কিভাবে আয় করে সংসারে সাহায্য করা যায়। ঠিক এমন সময়ই দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প সেই

এলাকায় কাজ শুরু করে। শিল্পির প্রচণ্ড আগ্রহ আর ইচ্ছার কারণে শেষ পর্যন্ত তার বাবা মা তাকে প্রকল্পভুক্ত হওয়ার অনুমতি দেয়। প্রকল্পের সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শিল্পি উক্ত প্রকল্পের একজন উপকারভোগী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। জীবনের ইচ্ছা পূরণের পথে নিজেকে তৈরি করতে শিল্পির সংগ্রাম শুরু হয় এখান থেকে।

দীর্ঘ ২২ দিন প্রশিক্ষণ শেষ করে গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে এ্যাপেক্স এডেলকী ফুডওয়্যার লিমিটেড, গাজীপুরে ২ (দুই) মাসের ইন্টার্ণশীপ-এ যোগদান করে। সফলভাবে ইন্টার্ণশীপ শেষে বর্তমানে শিল্পি 'অপারেটর' পদে এ্যাপেক্স ল্যাঞ্জারী, গাজিপুর-এ কর্মরত আছে। এখন সে প্রতিমাসে ৬ হাজার টাকা বেতন পায়। এছাড়াও ওভারটাইম কাজের জন্য অতিরিক্ত বেতন পায়। নিজের খরচ শেষে প্রতিমাসে ৩ হাজার টাকা করে নিয়মিতভাবে বাড়িতে পাঠায়। তার সহায়তায় তার ছোট দুটি ভাই এখন নিয়মিত স্কুলে যায়। শিল্পির পাঠানো টাকায় তাদের বাড়িটি মেরামত এবং ব্যবহারের জন্য ইতোমধ্যে শোকেস, খাট ও ড্রেসিং টেবিল তৈরি করেছে। শিল্পি নিজের সঞ্চিত টাকা দিয়ে বাবাকে একটি রিক্সা ক্রয় করে দিয়েছে এবং ৮ হাজার ৫শ টাকা দিয়ে, তার মাকে একটি গাভী কিনে দিয়েছে। তার জমানো টাকা দিয়ে তার বাবা-মা কিছুদিন আগে দেড় বিঘা জমি বন্ধক নিয়ে নিজেরাই আবাদ করছে। সবকিছু মিলিয়ে বর্তমানে শিল্পির প্রচেষ্টায় তারা অভাবের সীমানা পেরিয়ে অনেকটাই স্বচ্ছলতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

'বর্তমানে আমরা ভাল আছি; গ্রামের সকলে অনেক সম্মান করে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দাওয়াত করে, আর এসব কিছুর জন্য আমরা গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রতি চির কৃতজ্ঞ।'

- শিল্পির মা মঞ্জুরানী

দারিদ্র্যের সীমানা পেরিয়ে আশিকুর

গাইবান্ধা সদর উপজেলার ৮নং বোয়ালী ইউনিয়ন-এর দক্ষিণ হরিণসিংহায় অতিদরিদ্র পরিবারে অভাব অনটনের মধ্যদিয়ে বড় হয়ে উঠা একটি ছেলে নাম আশিকুর মিয়া, পিতা-আলমগীর মিয়া ও মাতা-বালি বেগম। এক ভাই এবং দুই বোনের মধ্যে আশিকুর সবার বড়। অনেক স্বপ্ন নিয়ে আলমগীর মিয়া তাদের সন্তানদের স্কুলে পড়তে পাঠিয়েছিল। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে ৮ম শ্রেণিতে উঠার পরই আশিকুরকে লেখাপড়ার পাঠ চুকাতে হয়। আশিকুরের পিতা অন্যের চায়ের দোকানে মেসিয়ারের কাজ করে কোন মতে তার সংসার চালাতো। সংসারের বোঝা বইতে বইতে এক সময় তার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ে আর এ অসুস্থতার কারণে অনেকেই তাকে আর কাজে নিতে চাইত না।

এমনই একটি সময়ে পণ উন্নয়ন কেন্দ্রের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে এলাকার মানুষ ও যারা ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে চাকুরী করছে তাদের কাছে সে বিষদভাবে জানতে পারে। পরে তাদের সহায়তায় সে প্রকল্প প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করে। এভাবেই সে প্রকল্পের নীতিমালা অনুসরণ করে প্রকল্পে তালিকাভুক্ত হয়। ২২ দিন প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের হাটুভাঙ্গায় কমফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেডে ২ মাসের ইন্টার্নশীপ-এ যোগদান করে। দুই মাসের ইন্টর্নশীপ সফলতার সাথে শেষ করলেও শারীরিক অসুস্থতা এবং শহরের পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে বাড়ি ফিরে আসতে হয় তাকে। সুস্থ হয়ে পরবর্তীতে গার্মেন্টসে কর্মরত আশেপাশের অন্যান্যদের পরিবর্তন দেখে পুনরায় নিজের চেষ্টায় গাজীপুরের সফিপুরে ব্লু ওসেন লিমিটেডে সহকারী মেশিন অপারেটর হিসেবে যোগদান করে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে নিজের দক্ষতায় অপারেটর হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে অদ্যাবধি সেখানেই কর্মরত আছে। বর্তমানে সে মাসিক বেতন ও ওভারটাইমসহ মাসে প্রায় ৮ হাজার টাকা আয় করে। প্রতিমাসে নিজের খরচ মিটিয়ে বাড়িতে ২-৩ হাজার টাকা করে পাঠাতে পারে। জমানো টাকা দিয়ে সে ১৫ হাজার টাকা ব্যয় করে বাড়িতে ১টি চৌচালা ১৩ ফুট টিনের ঘর তৈরি করেছে। এছাড়াও পরিবারের জন্য ১টা শোকেজ, ১টা খাট ও ৪টা চেয়ার কিনে নিয়েছে। অন্যের দোকানের কাজ করতে না দিয়ে অসুস্থ্য বাবাকে ১৫ হাজার টাকা খরচ করে একটি মুদির দোকান চালু করে দিয়েছে। ছোট ২ বোনের লেখাপড়া খরচ আশিকুর নিজেই বহন করছে। বর্তমানে আশিকুরের বাবার মুদির দোকান থেকে প্রতিদিন গড়ে ২-৩শ টাকা আয় হচ্ছে।

'আমার ছেলের কারণে বর্তমানে আমরা পরিবার পরিজনসহ সকলে খুব সুখেই আছি। অভাবের কারণে আশিকুরকে লেখাপড়া করাতে পারিনাই কিন্তু আমার অন্য ২ মেয়ে আশি ও আশার বেলায় এমন যেন না হয়, আমি সকলের কাছে সেই দোয়া চাই। পণ উন্নয়ন কেন্দ্র আমাদের পরিবারে আলোর পথ দেখিয়েছে; আমি ও আমার পরিবার সংস্থাটির নিকট চির কৃতজ্ঞ।'

- আশিকুরের মা বালি বেগম

অন্ধকার থেকে আলোর দুয়ারে মুক্তা

বাবা-মা ও মুক্তা মোট তিন জনের ছোট পরিবার। কিন্তু একমাত্র উপার্জনকারী বাবার বয়স হয়ে যাওয়ার ঠিকমত কাজ করতে পারেন না। ফলে তাদের অনেক অভাব-অনটনের মধ্যে চলতে হয়। মুক্তার বাবার নাম ইউনুস আলী, গ্রাম-উত্তর খোলাহাটী, ইউনিয়ন-খোলাহাটী, গাইবান্ধা সদর উপজেলা, গাইবান্ধা। বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান। বাবা ইউনুস আলী পেশায় একজন দিনমজুর। বাড়িভিটার দুই শতক জমি ছাড়া আর কিছুই নেই। সেই ভিটায় একটি মাত্র জীর্ণ কুঁড়েঘরে মুক্তাদের বসবাস। বাবা একদিন কাজ করতে না পারলে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হয় পরিবারের সকল সদস্যের। আর্থিক অনটনের কারণে চতুর্থ শ্রেণির পর আর পড়ালেখা হয়নি মুক্তার। মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলেও অভাবের কারণে তা পারেনি ইউনুস আলী। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ইউনুস আলী বিভিন্ন রোগে দিন দিন বেশি অসুস্থ হয়ে পরেন। যে কারণে মাঝে মাঝেই কাজে যেতে পারেন না তিনি। ভবিষ্যতের কথা ভেবে দিশেহারা হয়ে যায় মুক্তা আর তার মা।

এই সময়েই তাদের গ্রামের ইউপি সদস্য মৃদুল সাহেবের বাড়িতে গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের অনেক বড় পরিসরে একটি সভা হয়। সেখানে গ্রামের সকলের সাথে বাবা-মা সহ মুক্তা উপস্থিত হয়। সেখানে বিস্তারিত আলোচনা

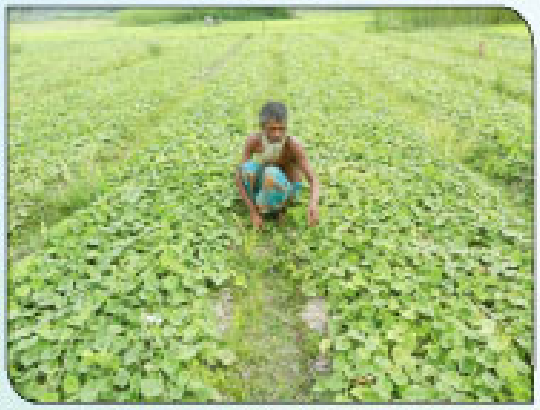

শোনার পর মুক্তার বাবা-মা খুব খুশি হয় এবং তাদের কাছে সবকিছু স্বপ্নের মত মনে হয়। তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তার বাবা-মা রাজি হয়ে যায় এবং মুক্তাও আন্তিভূত হয়ে যায় এই ভেবে যে, সে চাকুরী করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে এবং তাদের সংসারের জন্য কিছু একটা করতে পারবে। আর এভাবেই মুক্তার জীবনের আলোর দুয়ার উন্মোচিত হয়ে যায়।

প্রকল্পের সকল নিয়মনীতি অনুসরণ করে মুক্তা প্রকল্পের সদস্যভূক্ত হয় এবং দীর্ঘ ২২ দিনের প্রশিক্ষণ ও ০২ মাসের ইন্টার্নশীপ সফলতার সাথে সম্পন্ন করে এ্যাপেক্স এডেলকী ফুটওয়্যার লিমিটেড-এ মেশিন অপারেটর হিসেবে যোগদান করে অদ্যাবধি সেখানেই কর্মরত আছে। প্রকল্পের নিয়মানুযায়ী মুক্তাকে সব রকম সুযোগ সুবিধাসহ পরিবারের জন্য ২ হাজার টাকা দিয়ে একটি ছাগল ক্রয় করে দেয়া হয়। সে নিজের খরচ মিটিয়েও এ পর্যন্ত বাড়িতে প্রায় ২৩ হাজার টাকা পাঠিয়েছে। সেই টাকা দিয়ে তার বাবা দুই বিঘা জমিতে আদি হিসেবে ধান চাষ করেছে এবং এক বিঘা জমিতে পটল চাষ করছে। তার বাবা মা'র স্বপ্ন যে, ওই জমিতে ফসল তোলার পর বিক্রি করে লাভের টাকা দিয়ে ঘর মেরামত করবে এবং মূল পুঁজি পুনরায় ফসল চাষে ব্যবহার করবে। এখন সে নিয়মিত ২-৩ হাজার টাকা করে বাড়িতে পাঠাচ্ছে। মুক্তার পাঠানো টাকাই এখন তাদের সংসারের আয়ের প্রধান উৎস এবং এ পর্যন্ত তার মা ৫ হাজার টাকা সঞ্চয় করেছে। মুক্তার অসুস্থ বাবা এখন কিছুটা ভারমুক্ত হয়েছেন। ইতোমধ্যেই মুক্তার বাবা ১২টি কংক্রিটের খুঁটি তৈরি করে এবং কিছু টিন দিয়ে তাদের থাকার ঘরটি মেরামত করা হয়েছে। পরিবারের অভাব-অনটন ঘুচিয়ে বর্তমানে মুক্তা ও তার পরিবার খুব সুখে ও স্বাচ্ছন্দে আছে।

'আমি মেয়ে হয়ে একজন ছেলের মতই পরিবারের সকল দায়-দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি। বাবার এখন বয়স হয়েছে, সেজন্য তাকেও আর আমি মাঠে কাজ করতে দিতে চাই না।'

- মুক্তা

আনন্দের ছোঁয়া এখন লোকমানের পরিবারে

গাইবান্ধা সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামের উত্তর হরিণসিংহা গ্রামের আবুল কালাম-এর পুত্র লোকমান। তারা এক ভাই ও দুই বোন। দারিদ্র্য এবং অশিক্ষার কারণে কম বয়সেই দুই বোনের বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। বর্তমানে লোকমান ও বাবা-মা সহ মোট ৩ জনের পরিবার। ছোট পরিবার হলেও তাদের পরিবারে অভাব অনটন লেগেই থাকত। ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনার পর লোকমানের আর পড়াশুনাও করা হয়নি। কিছু কাজকর্মও করে না শুধু এলাকায় ঘুরে ঘুরে বেড়াত। যে কারণে তার বাবা-মা সব সময়ই উদ্বিগ্ন থাকত লোকমানের ভবিষ্যত নিয়ে। বাবা-মা ভাবতো একে কোন্ কাজে লাগানো যায়। এভাবেই একদিন পার্শ্ববর্তী আল আমিন-এর নিকট থেকে জানতে পেল যে, গণ উন্নয়ন কেন্দ্রে গার্মেন্টস শিল্পে দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ চলছে। সেকথা শুনে লোকমান প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রকল্পের কর্মীর সাথে যোগাযোগ করে তার এবং পরিবারের সবার ইচ্ছার কথা জানায়। পরবর্তীতে প্রকল্পের নীতিমালা অনুসরণ করে লোকমানকে প্রকল্পভুক্ত করা হয়। ২২ দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে লোকমান স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে এবং আনন্দের সাথে প্রশিক্ষণ শেষে এ্যাপেক্স এভেলকী ফুটওয়ার লিমিটেড, গাজীপুরে দুই মাসের ইন্টার্নশীপ কার্যক্রমে যোগদান করে। ইন্টার্নশীপ শেষ করে আরো দুই মাস সে জুনিয়র অপারেটর হিসেবে সেখানে চাকুরী করে। তারপর লোকমান এলিগেন্স সুয়েটার লিঃ, গাজীপুরে বেশি বেতনে অপারেটর হিসেবে যোগদান করে।

বর্তমানে সে ৯ হাজার ৩শ টাকা করে প্রতিমাসে বেতনভাতা পায়। নিজের খরচ মিটানোর পরেও প্রতি মাসে সে তার পরিবারের জন্য তিন থেকে চার হাজার করে টাকা পাঠায়। লোকমানের বাবা দিন মজুরী করে সংসার চালাত কিন্তু ছেলের পাঠানো টাকা আস্তে আস্তে জমিয়ে সেই টাকা দিয়ে তার বাবা মা বাড়িতে মুড়ি ভেজে ব্যবসা শুরু করলেন। আস্তে আস্তে তাদের ব্যবসার প্রসার ঘটতে লাগল। এখন আর তার বাবা দিনমজুরী করে না। লোকমানের বাবা ও মা মিলে এখন প্রতিদিন ১৫ কেজি চালের মুড়ি ভেজে গাইবান্ধা শহরের নির্দিষ্ট কিছু দোকানে বিক্রি করছে। এই ব্যবসায় তাদের আয়ও আস্তে আস্তে বাড়ছে। ব্যবসার লাভ এবং ছেলের পাঠানো টাকা থেকে তাদের পরিবারে এখন নগদ সঞ্চয় রয়েছে ২০হাজার টাকা যা লোকমানের বাবা ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে বলে ঠিক করেছে। পরিবারে আনন্দের ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে। পুষ্টিকর খাবারও খেতে পারছে। নিজেদের ঘরে ব্যবহারের জন্য তারা চেয়ার-টেবিল ও খাট কিনেছে। লোকমানের পরিবার প্রকল্প হতে ১টি ছাগল পেয়েছিল যার ২টি বাচ্চাও হয়েছে।

"আমার ছেলে একবার যখন সুযোগ পেয়েছে ওকে আর কেউ আটকাতে পারবে না
ও নিজের কাজ দিয়েই অনেক উপরে উঠবে।"
- লোকমানের বাবা

আরো এগিয়ে যেতে চায় এসমোতারা

বিয়ের হওয়ার ০৬ (ছয়) বছরের মধ্যেই স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত হয়ে ২ বছর বয়সের মেয়ে মুন্নিকে সাথে নিয়ে দিন মজুর বাবার বাড়িতে চলে আসতে হয় এসমোতারাকে। তার বাবার পরিবারের সদস্য সংখ্যাও অনেক বেশি। এসমোতারার আরো ছোট ছোট পাঁচ ভাই বোন আছে। এসমোতারার বাবা মোঃ ওয়েছ উদ্দিন নিজগ্রাম ঝাকুয়াপাড়া, গিদারী, গাইবান্ধা অন্যের জমিতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করে। দিনমজুর বাবার স্বল্প আয়ে কোন রকমে খেয়ে না খেয়ে চলতো তাদের সংসার।

২নং ওয়ার্ড-এর ইউপি সদস্য ও প্রকল্প কর্মীর মুখে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারে এসমোতারা। এরপর প্রকল্পের নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসমোতারা প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত হয়। সাথে সাথেই খুলে যায় এসমোতারার জীবন যুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর নতুন পথ।

এসমোতারার স্বাবলম্বী হওয়ার পথে পথচলা শুরু হয় দীর্ঘ বাইশ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। প্রশিক্ষণ শেষ করে এ্যাপেক্স এডেলকি ফুটওয়ার লিমিটেড-এ দুই মাসের ইন্টার্নশীপে যোগদান করে। সফলভাবে ইন্টার্নশীপ শেষে

বর্তমানে এসমোতারা মেশিন অপারেটর হিসেবে এ্যাপেক্স এডেলকী ফুটওয়্যার লিমিটেডে কাজ করছে। তার বর্তমান বেতন ৫ হাজার ৩শ টাকা। সে প্রতি তিন মাস পরপর ৭-৮ হাজার টাকা করে বাড়িতে পাঠায়। সেই টাকা থেকে ৩০ হাজার টাকা দিয়ে তার পরিবার এসমোতারার নামে ১৬ শতক কৃষি জমি বন্ধক নিয়েছে। বর্তমানে এসমোতারার বাবা সেই জমি চাষাবাদ করেছে। এছাড়াও তার নামে ৪ শতক জমি কেনার জন্য ৩ হাজার টাকা বায়না হিসেবে দিয়ে রেখেছে বাকি টাকা ডিসেম্বর, ২০১৩-এর মধ্যেই পরিশোধ করার শর্তে।

অন্যদিকে এসমোতারা প্রতিমাসে ৩শ টাকা করে ডিপিএস-এর মাধ্যমে সঞ্চয় করেছে। বাবা-মা, ছোট ভাইবোনসহ নিজের মেয়ের প্রয়োজনীয় পোশাক পরিচ্ছদসহ প্রয়োজনীয় আনুসঙ্গিক সকল খরচ এসমোতারা করছে। এসমোতারার স্বপ্ন খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাড়িতে একটি টিনের ঘর বানানোর। এসমোতারা এখন অনেক সচেতন। সহজেই সে বুঝতে পারে কিভাবে নিজের জীবনের উন্নতি করতে হয়। তাই আর পিছনের দিকে না ফিরে সামনের দিকে এগোতে চায়। নিজে স্বাবলম্বী ও তার মেয়ের উজ্জল ভবিষ্যতে তৈরি করতে সে আত্মবিশ্বাসী।

"আগে সংসারে দু'বেলা খাবারের সামর্থ ছিল না, মেয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্মনিষ্ঠায় আমাদের সেই অভাব-অনটন দূর হয়েছে। আমি গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের এই উপকার কখনোই ভুলবো না।"
- এসমোতারার বাবা ওয়েছ উদ্দিন

বেকার তসলিমের ভবঘুরে জীবনের অবসান

গাইবান্ধা সদর উপজেলার কামারজানী ইউনিয়নের ব্রহ্মপুত্র নদের ধার ঘেঁষে গো-ঘাট গ্রামে তসলিমের বাড়ি। গ্রামটিতে অধিকাংশ নদী ভাঙা মানুষের বাস। বাবা আমিন হোসেন, মা তোলাপি বেগম ও বোন আমিনা মিলে চার জনের পরিবার। তসলিমের বাবা একজন দিন মজুর। অন্যের বাড়িতে কামলা দিয়ে রোজগার করে। মা পরের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে কিছু আয় করে। গ্রামের ধনী লোকেরা তসলিমের বাবাকে আদি হিসাবে জমিও দিত না। কারণ ফসল করার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তাও সে জোগাড় করতে পারবে না। এইভাবে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটছিল তসলিমদের পরিবারের। অর্থের অভাবে চতুর্থ শ্রেণির বেশি আর পড়াশুনা করা হয়নি তসলিমের। অন্যান্য ছেলেদের মত তহুলিমও পড়াশুনা না করে বেকারভাবে ঘুরে বেড়াতো। পরিবারের জন্য কিছু করতো না বলে মাঝে মাঝেই বাবা-মা'র গালমন্দ শুনতে হতো তসলিমকে।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গো-ঘাট এলাকায় একটি মিটিং আয়োজন করে। মিটিং-এ উপস্থিত থেকে তহুলিম নিজেকে বদলে নেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত হয়। তসলিমের বাবা ছেলেকে নিয়ে আশার আলো দেখতে পায়। প্রকল্পের সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তসলিম উক্ত প্রকল্পের একজন উপকারভোগী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়।

তালিকাভুক্ত হওয়ার পর দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের প্রথম ব্যাচেই ২২ দিনের প্রশিক্ষণ সন্তোষজনকভাবে শেষ করে গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে ঢাকার মিরপুরে র‍্যাটেক্স ফ্যাশনওয়ার লিমিটেড-এ দুই মাসের ইন্টার্নশীপে যোগদান করে তসলিম।

দুই মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজেকে একজন দক্ষ অপারেটর হিসেবে প্রমাণ করতে পেরেছে। যার ফলশ্রুতিতে র‍্যাটেক্স ফ্যাশনওয়ার লিমিটেড-এ মেশিন অপারেটর হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু হয়। অল্প কিছুদিন চাকুরী করার পর ঢাকা শহরে জীবনযাত্রার ব্যয় অত্যাধিক হওয়ায় সে অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধি না হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে পুনরায় বাড়ি ফিরে আসে। আবারও শুরু হয় তসলিমের বেকার ভবঘুরে জীবন। প্রকল্পের কর্মীরা নিয়মিত তার সাথে যোগাযোগ করে যোগাতে থাকে। পরিবার থেকেও চাপ দেয়া হয় পুনরায় চাকুরীতে যোগদান করার জন্য। সর্বশেষ ৪ মাস বাড়িতে অবস্থানের পর নিজের বেকার জীবন আর ভাল লাগে না তসলিমের। প্রকল্প কর্মীর পরামর্শে এবং পরিচিত একজনের মাধ্যমে তসলিম 'সহকারী অপারেটর' পদে এ্যাপোলো গার্মেন্টেস, দুয়ারি পাড়া, ঢাকায় যোগদান করে। তার কর্মদক্ষতার ফলে অল্প সময়েই অপারেটর পদে পদন্নতি পেয়ে বর্তমানে সেখানেই কর্মরত আছে। এখন সে প্রতিমাসে গড়ে ৮ হাজার ৫শ টাকা করে আয় করছে। নিজের খরচ মিটিয়েও প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা করে সে বাড়ি পাঠাচ্ছে। তসলিম তার নিজের নামে ২টি বীমা করেছে যেখানে প্রতিমাসে জমা করছে যথাক্রমে ৫শ ও ২শ টাকা। পিতা পুত্রের যৌথ আয়ে ২৭ হাজার টাকা দিয়ে ৩০ হাত টিনের ঘর তৈরি করেছে। তসলিম তার মা'কে ১২ হাজার টাকা দিয়ে একটি গাভী কিনে দিয়েছে। তসলিমের বাবা ২ বিঘা জমি আদি নিয়ে চাষাবাদ করছে। যা আগে তাকে দিতে কেউ সাহস পায়নি। বর্তমানে তারা ৩ বেলা ভালো ভাবে খেতে পারছে। ছোট বোন আমেনা এখন চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ছে। সামাজিকভাবে মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিবাচক পরিবর্তনও এসেছে পোষাক পরিচ্ছেদও।

"আমার তসলিম আরও বড় হউক। গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের জন্য অনেক দোয়া করি যেন সব সময় সংস্থাটি মানুষের জন্য কাজ করে যেতে পারে।"

- তসলিমের মা তোলাপি বেগম

স্বপ্ন পূরণের প্রচেষ্টায় আরজিনা

আরজিনা খাতুন, পিতা-মৃত আজিজ মিয়া ও মাতা-মোছাঃ মুক্তা বেওয়া। তিন বোনের মধ্যে দ্বিতীয় আরজিনা খাতুনের পৈত্রিক নিবাস ছিল বল্লমঝাড় ইউনিয়নের বিনেশ্বর গ্রামে। বাবা ছিল পেশায় দিনমজুর যার একার আয় দিয়ে কোন রকমে সংসার চলতো। অভাবের টানাটানিতে মেয়েদের তেমন পড়াশুনা করাতে পারেনি। তবুও আরজিনা অতিকষ্টে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করে। হঠাৎ করেই একদিন মৃত্যু হয় আরজিনার বাবার। ঠিক এমনি একটি অবস্থায় আরজিনার মা'র মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কিভাবে সংসার চলবে তার কোন কূলকিনারা খুঁজে পায় না। আরজিনার বাবার মৃত্যুর পর বাবার বাড়িতে থাকার অধিকারটুকুও তারা হারিয়ে ফেলে। কোন উপায় না পেয়ে দুই মেয়েকে নিয়ে আরজিনার মা তার স্বামীর ভিটামাটি ছেড়ে একই ইউনিয়নের উত্তর ধানঘড়া গ্রামে তার বাবার বাড়িতে চলে আসে এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকে। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই বড় মেয়েটাকে বিয়ে দেয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন মুক্তা বেওয়া। স্বামীর রেখে যাওয়া কিছু টাকা, কিছু ধারদেনা আর অন্যের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে মুক্তা বেওয়া তার বড় মেয়েকে রাজমিস্ত্রী ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। বড় বোনের বিয়ের পর আরজিনাদের তিন জনের সংসার কোন মতে খেয়ে না খেয়ে কাটতো।

সংসার চালাতে আরজিনার মা অন্যের বাড়িতে ঝি-এর কাজ শুরু করে তা দিয়ে কোনমতে খেয়ে না খেয়ে দিন কাটতে থাকে তাদের। এমনই এক অসহায় অবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কাজের বিনিময়ে অর্থ কর্মসূচির আওতায় মাটিকাটার কাজ দিলে কোন রকমে তাদের দিন চলতে থাকে। কিন্তু আরজিনার মায়ের দুশ্চিন্তা তার অবিবাহিত মেয়ে দুইটিকে ঘিরে। কি করবে, কোথায় যাবে, কোন কিছুই সে ভেবে পায় না। এমনি একটি সময়ে গ্রামের এক সভার মাধ্যমে তারা গণ উন্নয়ন কেন্দ্র-এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের কথা জানতে পারে যেখানে উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্যসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সভায় প্রকল্পের নিয়ম-কানুন, উপকারভোগী নির্বাচনসহ সামগ্রিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী উপকারভোগী হিসেবে আরজিনার নাম চলে আসে। তার মা'সহ পাড়া প্রতিবেশীর সম্মতিক্রমে প্রকল্পের ৮ম ব্যাচে তাকে তালিকাভুক্ত করা হয়। এরপর শুরু হয় জীবন পথের নতুন এক সংগ্রাম। ২২ দিনের প্রশিক্ষণে

সফলভাবে অংশগ্রহণ করে রেঞ্জার ফ্যাশান, মালিবাগে দুই মাসের ইন্টার্নশীপের সুযোগ পায় আরজিনা। আত্মবিশ্বাসী এবং দৃঢ় মনের অধিকারী আরজিনা প্রশিক্ষণ ও ইন্টার্নশীপে কঠোর পরিশ্রম করে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলে। আসে সাফল্য, সফলভাবে তার ইন্টার্নশীপ শেষ করে মেশিন অপারেটর হিসেবে রেঞ্জার ফ্যাশান, মালিবাগ-এ যোগদান করে। আরজিনা ও তার পরিবার নতুন করে আশার আলো দেখতে পায়। এমনিভাবেই শুরু হয় আরজিনার ব্যস্ত কর্মজীবন। একটু একটু করে তার আশা ও প্রত্যাশাগুলো পূরণ হতে থাকে। পরিবারের সকল সদস্যের ভরণপোষণ নিশ্চিত করে ছোট বোনের লেখাপড়ার দিকে দৃষ্টি দেয় আরজিনা।

মনে মনে সে স্বপ্ন দেখতে থাকে পরিবারের জন্য কিছু সম্পদ করার। সেই লক্ষে চলতে থাকে তার প্রচেষ্টা। প্রথমে ১২ হাজার ৩শ টাকায় ১টি গাভী ক্রয় করে তার মাকে দেয় এবং গাভীটির জন্য একটি ঘরও তৈরি করে দেয়। গত জুলাই মাসে গাভীটির একটি বাচ্চা হয়। নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে গাভীটির কিছু দুধ বাইরেও বিক্রি করতে পারে। আরজিনা নিজের খরচ মিটিয়েও প্রতিমাসে ৩-৪ হাজার করে টাকা বাড়িতে পাঠাচ্ছে। আরজিনার মা তার নিজের মাটি কাটার আয় এবং আরজিনার পাঠানো টাকাসহ মোট ৭০ হাজার টাকা জমিয়েছে যা দিয়ে তারা চাষাবাদ করার জন্য একটি কৃষিজমি বন্ধক নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। আরজিনা এখন নিজেকে অনেকটা স্বাবলম্বী মনে করে। এখন তার ভবিষ্যত স্বপ্ন দীর্ঘদিন গার্মেন্টস সেক্টরে কাজ করার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুপারভাইজার পদে উন্নীত হওয়ার।

'আমার মেয়ের এই রকম উন্নতিতে আমি আনন্দে আত্মহারা, বর্তমানে আমরা এখন অনেক সুখী।'
- আরজিনার মা মুক্তা বেওয়া

সুখময় জীবন কাটছে মোসলেমার

মোসলেমার বাবা মতিয়ার রহমান মা মরিয়ম বেগম, গাইবান্ধা সদরের ঘাগোয়া ইউনিয়নের কালেজপাড়া গ্রামে তাদের বসবাস। তিন বোনের মধ্যে মোসলেমা প্রথম। পড়াশুনা করেছে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। দিনমজুর বাবা অন্যের জমিতে কাজ করে সংসার চালায়। নিজস্ব কোন কৃষি জমি নেই। সামান্য বসতভিটাটুকুই সম্বল। নিকট আত্মীয়র অতি উৎসাহে বাবা মা ১৫ বছর বয়সেই পার্শ্ববর্তী মালিবাড়ি ইউনিয়নের কাবিলের বাজার পূর্বপাড়ার মরহুম আবেদ আলির চতুর্থ পুত্র সাইফুলের সাথে মোসলেমার বিয়ে দিয়ে দেন। সাইফুলের নিজস্ব কোন জমি এমনকি নিজস্ব কোন ঘরও নেই। তাইতো সাইফুল বিয়ে করে মোসলেমাকে নিয়ে বড় ভাইয়ের ঘরে ওঠে। দিনমজুরী করে, মাঝে মধ্যে রিক্সা চালিয়ে কোন রকমে সংসার চালাতো সাইফুল কিন্তু বড় ভাইয়ের ঘরে বউ নিয়ে থাকায় নিজের কাছে খুব খারাপ লাগত তার।

সাইফুল একদিন কাজে যেতে না পারলে সেদিন তাদের পেটে ভাত জুটতো না, তার উপর অন্যের বাড়িতে থাকা যা তাদের অসহায়ত্বকে অনেকটা বাড়িয়ে দিত। বিয়ের পর এভাবে ৫/৬ মাস চলার পর ভাসুরের বাড়িতে টিকতে না পেরে স্বামী সহ বাবার বাড়িতে চলে আসে মোসলেমা। মোসলেমার স্বামী সাইফুল শ্বশুর বাড়িতে এসেও দিনমজুরী করে এবং মাঝে মধ্যে রিক্সা চালিয়ে সংসার চালাতে থাকে। মোসলেমার বাবা সংসার চালানোর জন্য মোসলেমাকে মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য সহযোগিতাও করতো। এভাবেই দিন কাটতে থাকে মোসলেমার। সংসারে দুটি পুত্র সন্তান আসে। বর্তমানে বড়টির বয়স আট এবং ছোট ছেলেটির বয়স সাড়ে ছয় বছর।

এমনি এক সময় গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে জানতে পারে মোসলেমার স্বামী। তারা আলাপ পরামর্শ করে ঠিক করে যে সংসারের প্রয়োজনে মোসলেমা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পে যোগদান করবে। তারা উদ্যোগী হয়ে প্রকল্প কর্মীর সাথে যোগাযোগ করে। প্রকল্পের নীতিমালার মধ্যে থাকায় সহজেই প্রকল্পভুক্ত হয়ে যায় মোসলেমা। অবশেষে মোসলেমার কষ্ট লাঘবের দিন শুরু হয় ২২ দিনের গার্মেন্টস শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। প্রশিক্ষণ শেষে ২ মাসের ইন্টার্নশীপও সফলভাবে সমাপ্ত করে যোগ দেয় নূরুল গার্মেন্টস, মৌচাক, গাজিপুরে। মাঝে একবার বাড়িতে এসে স্বামীর সাথে পরামর্শ করে স্বামীকেও উক্ত গার্মেন্টসে চাকুরীর জন্য নিয়ে যায় এবং যথারীতি গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ক্রমে স্বামীর চাকুরীর ব্যবস্থা করে। তাদের দু'সন্তানকে রেখে যায় নানা-নানীর কাছে। দুজনে আয় করে ভালভাবেই তাদের সংসার চলতে থাকে। দু'জনের আয় রোজগার বেড়ে গেলে মোসলেমা তাদের বড় ছেলে সাগরকে ব্র্যাক স্কুলে এবং ছোট ছেলে স্বাধীনকে মাদ্রাসায় ১ম শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দেয়।

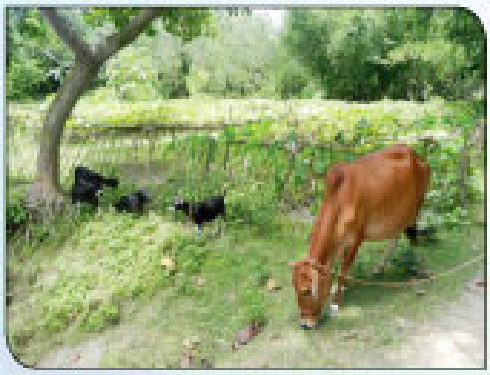

মোসলেমার স্বপ্ন তাদের ছেলেদের সে কষ্টে থাকতে দেবে না যে কোন মূল্যে তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবে। চাকুরীর টাকা দিয়ে মোসলেমা ইতোমধ্যেই ১৯ হাজার টাকায় ১টি গাভী কিনে তার মা'কে দিয়েছে। নিজে ১টি ডিপিএস করেছেন, যার জমা প্রতি মাসে ১শ টাকা টাকা করে। মোসলেমার স্বপ্নগুলো ধীরে ধীরে পূরণ হতে লাগল। মোসলেমা তার বাবাকে ২ বিঘা জমি আদি নিয়ে দিয়েছে যার ফসল চাষের সম্পূর্ণ খরচ সে নিজের আয় থেকে দিচ্ছে। বাবার বাড়িতে ঘর মেরামত করে দিয়েছে। মোসলেমা ও তার স্বামী যে টাকা আয় করে তা থেকে নিজেদের খরচ মিটিয়েও মোসলেমা তাদের সন্তানদের জন্য প্রতিমাসেই ৩-৪ হাজার করে টাকা বাবার কাছে পাঠাচ্ছে। মোসলেমার পাঠানো টাকা থেকে এবং জমি আদি করে মোসলেমার বাবা মোসলেমার জন্য নগদ ২০ হাজার টাকা সঞ্চয় করেছে। এদিকে মোসলেমার হাতেও সব সময় এখন নগদ টাকা থাকে যা আগে কখনও থাকত না। মোসলেমারা এবং তার বাবার পরিবার উভয়েই এখন পেট ভরে খাবার খেতে পারছে। তাদের পোশাকেও পরিবর্তন এসেছে। আত্মবিশ্বাসী মোসলেমা এবং তার স্বামী পরিবারের সবাইকে নিয়ে এখন সুখময় জীবন কাটছে। তারা ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করতে চায়। নিজেরা বাড়ী করতে চায়। তারা জিইউকের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানায়।

"দুঃসহ অভাবের কারণে একসময় আমাদের সংসার ঠিকমত চলেনি। গণ উন্নয়ন কেন্দ্র-এর সহায়তায় আজ আমি এ অবস্থার পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছি। বর্তমানে আমার স্বপ্ন ছেলে আর মেয়েটিকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে সফল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।"

- মোসলেমা

উপসংহার

দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পটির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়ায় এলাকায় বেকার তরুণ-তরুণী এবং অতিদরিদ্র পরিবারের মাঝে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। কার্যকরী ও সময়োপযোগী প্রকল্পটির চাহিদা ধীরে ধীরে গাইবান্ধা সদর উপজেলা ছাড়াও অন্যান্য উপজেলায় ছড়িয়ে পড়ছে। গার্মেন্টস শিল্পে প্রশিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের ও পরিবারের উন্নয়নের পাশাপাশি এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও অবদান রাখতে পারছে। কর্মরতরা একসময় আরো অধিক দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম ও স্থানীয় উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসলে গাইবান্ধা অঞ্চলে গার্মেন্টস বা এরূপ শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে যা এলাকার উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখতে সহায়ক হবে। জিও, এনজিও এবং প্রাইভেট সেক্টরের সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের এরূপ উদ্যোগের সম্ভাবনা ভবিষ্যতে শুধু গার্মেন্টস সেক্টরেই নয় অন্যান্য অনেক সেক্টরেই রয়েছে।

সম্ভাবনার ক্ষেত্রসমূহ

- কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য গার্মেন্টস ছাড়াও অন্যান্য ট্রেডেও কাজ করা যেতে পারে;
- রংপুর বিভাগে দরিদ্র পরিবারে যেমন প্রচুর সংখ্যক বেকার তরুণ-তরুণী রয়েছে তেমনি গার্মেন্টেস সেক্টরেও রয়েছে অনেক বেশী কর্ম সংস্থানের সুযোগ;
- স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে গামেন্টস শিল্প, কারখানা ও প্রশিক্ষক উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা ইনস্টিটিউট গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)
নশরৎপুর, গাইবান্ধা ৫৭০০
পোস্ট বক্স-১৪, বাংলাদেশ।
ফোন ও ফ্যাক্স: +৮৮ ০৫৪১-৮৯০৪২,
মোবাইল: ০১৭১৩-৪৮৪৬৯৬
ইমেইল: guk.gaibandha@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.guk.org.bd